আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মদীনার জীবন দাওয়াত, জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ (العهد المدنى عهد الدعوة والجهاد والنجاح)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

মদীনার অধিবাসীগণ এবং হিজরতের সময় তাদের অবস্থা (سكان المدينة واحوالهم عند الهجرة):

অশান্তি এবং উপহাসের লক্ষ্য বস্তু হওয়া থেকে নিস্কৃতিলাভই শুধু হিজরতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এ উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল যে, এক শান্তিপূর্ণ এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের জন্য স্বস্তি ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা। এ কারণে সকল সমর্থ মুসলিমগণের জন্য এটা ফরজ করে দেয়া হয়েছিল যে, এই নতুন দেশ ও নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণ কাজে তারা সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করবেন এবং একে রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্যাদার উচ্চশিখরে সমাসীন করার ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আর এ কথা তো সন্দেহাতীতভাবে সকলেই অবগত আছেন যে, এ মহতি জীবনধারার রূপকার এবং এ মহান জাতির ইমাম নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন স্বয়ং বিশ্বের সেরা মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।

মদীনাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কে গড়ে তুলতে হয়েছিল যাদের একগোষ্ঠি থেকে অন্যগোষ্ঠির অবস্থা ছিল ভিন্ন এবং পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যার ভিন্নতার প্রাধান্যই ছিল বেশী। গোষ্ঠী তিনটির পরিচিতি হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহর মনোনীত রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে উত্তম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন প্রাণ উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবী (রাঃ)-এর জামাত বা গোষ্ঠী।

২. মদীনার আদি ও মূল বাসিন্দাদের মুশরিক (পৌত্তলিক) গোষ্ঠী যারা তখনো ঈমান আনে নি।

৩. ইহুদীগণ

(ক) সাহাবীগণ (রাঃ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো তা হচ্ছে- তাদের জন্য মদীনার অবস্থা অবশ্যই মক্কার অবস্থার বিপরীত ছিল। যদিও তাঁদের দ্বীন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা দ্বীনী কাজ কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল, কিন্তু মক্কা জীবনে তারা বসবাস করতেন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। আর তাঁরা ছিলেন নিরুপায়, পর্যুযদস্ত, অপমানিত ও দুর্বলতর। তারা আত্মিক ও নৈতিকবলে চরম বলীয়ান হলেও লৌকিক শক্তি সামর্থ্য কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সকল প্রকার শক্তি ও সম্পদ পুঞ্জীভূত ছিল ধর্মের চির দুশমনদের হাতে। এমনকি মানবিক জীবন যাপনের জন্য সে সকল আসবাবপত্র এবং উপকরণাদির ন্যূনতম প্রয়োজন সে সব কিছুই ছিল না মুসলিমগণের হাতে যাকে সম্বল করে তারা নতুনভাবে ইসলামী সমাজ গঠন করতে সক্ষম হবেন। কাজেই আমরা দেখতে পাই মক্কী সূরাহগুলোতে কেবলমাত্র ইসলামের প্রারম্ভিক বিষয়গুলোরই বর্ণনা রয়েছে এবং ঐ সকল বিষয়ের উপর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যা ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব। অধিকন্তু এ পর্যায়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূত পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি ও উত্তম চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অনৈতিক ও অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে পরহেজ করে চলার জোর তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মদীনা জীবনের প্রথম থেকেই নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের বাগডোর ছিল

মুসলিমগণেরই হাতে। মুসলিম ছাড়া মদীনা কিংবা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল সম্প্রদায় ছিল, ইসলাম সূর্যের নিকট তাদের নেতৃত্ব ছিল নিষ্প্রভ। কাজেই তখন এমন এক সময় ও সুযোগ এসেছিল যাতে মুসলিমগণ তাহযীব, তামাদ্দুন ও স্থাপত্য জীবনধারা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই ইসলামের বিধি বিধান ও অনুশীলন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এর ফলে হালাল, হারাম, ইবাদত, আখলাক ইত্যাদি জীবনের সব ব্যাপারে পুরাপুরি মীমাংসা করা সম্ভব হয়।

সময় ও সুযোগ এসেছিল মুসলিমগণের জন্য এমন এক জীবন-ধারা প্রবর্তনের যা ছিল জাহেলিয়াত যুগের জীবন-ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমনকি পৃথিবীর কোথাও এমন কোন জীবন ধারা ছিল না যার সঙ্গে এর কোন তুলনা করা যেতে পারে। বিগত দশ বছর যাবৎ মুসলিমগণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে এমন এক জীবন ধারা গড়ে তুলেছিলেন কোন কালে কোথাও যার তুলনা মিলবে না।

এ প্রসঙ্গে যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হচ্ছে এ জাতীয় কোন জীবন ধারার রূপ এক দিনের, এক মাসের কিংবা এক বছরের কাজ হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি দীর্ঘ সময়ের যাতে করে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে এর বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা এবং নীতি-নির্ধারণী কাজের অভ্যাস ও চর্চা এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করা সম্ভব হতে পারে। ইসলাম যে পর্যন্ত বিধি-বিধান প্রদান সংগ্রহ সংরক্ষণের পর্যায়ে ছিল তার জিম্মাদার ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। পক্ষান্তরে, এ সবের বাস্তবায়ন মুসলিমগণের চর্চা ও অভ্যন্তকরণ এবং পথ প্রদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। ফলে ইরশাদ হয়েছে ,

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) [الجمعة: 2].

‘তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।’ (আল-জুমু‘আহ ৬২ : ২)

এদিকে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) এই অবস্থা ছিল যে, তাঁরা সর্বক্ষণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতেন। যে কোন আহকাম নির্ধারিত হওয়া মাত্র তা কায় মনোবাক্যে গ্রহণ করে নিতেন এবং তা পালন করে আনন্দ লাভ করতেন। ইরশাদ হয়েছে,

(وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا) [الأنفال: 2].

‘‘আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে...।’ (আল-আনফাল ৮ : ২)

এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কাজেই এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশটুকু আলোচনা করব।

যাহোক, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মুসলিমগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এবং দাওয়াতে ইসলামীয়ার ও রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার এটাই ছিল বড় রকমের উদ্দেশ্য, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা কোন ক্ষণস্থায়ী বিষয় ছিল না। বরং স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থায়ী ব্যাপার ছিল। অবশ্য এ ছাড়া এমন কিছু অন্যান্য বিষয়ও ছিল যা সমাধানের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। যার সংক্ষিপ্ত অবস্থা নিম্নরূপ :

মুসলিমগণের মধ্যে দু’শ্রেণীর লোক ছিলেন, প্রথম শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন যাঁরা নিজস্ব জমিজমা, ঘরবাড়ি এবং

ধনসম্পত্তির মধ্যে বববাস করতেন। এ সম্পর্কে তাদের অন্য কোন অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছিল না, যা একজন লোককে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শান্তিতে থেকে করতে হয়। এরা হচ্ছেন আনসার গোত্রীয় লোক। এদের মধ্যে বংশানুক্রমে একে অন্যের সঙ্গে প্রবল শত্রুতা ও মত বিরোধ চলে আসছিল। তাঁদের পাশাপাশি অন্য যে দলটি ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মোহাজের গোত্র। ঐ সকল সুবিধা হতে সম্পূর্ণরূপে এরা বঞ্চিত ছিলেন। লুণ্ঠিত হয়েও মার খেয়ে নিঃস্ব এবং রিক্ত অবস্থায় ভাগ্যের প্রতি ভরসা করে কোনরূপে মদীনায় পৌঁছে ছিলেন।

মদীনায় বসবাসের জন্য মুহাজিরদের জন্য কোন বাসস্থান বা আহার ও পোষাকের জন্য কোন কর্ম সংস্থান ছিল না। অথবা কোন প্রকার ধন ও সম্পদ ছিল না, যার দ্বারা তাঁরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। অথচ এ আশ্রয় প্রার্থী মোহাজিরদের সংখ্যা কম ছিল না। তদুপরি দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল। কারণ, সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন তারা যেন হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। অথচ এটা জানা কথা যে, মদীনাতে সম্পদ বলতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই ছিল না। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এর ফলে মদীনার অর্থনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ল। ইসলাম বিরোধী চক্র এ বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক বয়কট আরম্ভ করে দেয়। কাজেই আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিমগণের বিরুদ্ধে অন্তরে কোন বিদ্বেষ বিরোধিতা কিংবা শত্রুতার মনোভাব ছিল না।

(খ) দ্বিতীয় সম্প্রদায়ঃ মদীনার মূল পৌত্তলিক (মুশরিক) অধিবাসী এ সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলিমগণের উপর এদের কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব ছিল না। কিছু সংখ্যক মুশরিক সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিল এবং পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগের ব্যাপারে সন্দিহান ও অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ বিরোধিতা কিংবা শত্রুতার মনোভাব ছিল না। এ শ্রেণীর মানুষ স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের দলভুক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এমন কিছু সংখ্যক মুশরিক ছিল যারা অন্তরে অন্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মুসলিমগণের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অন্তরে তাদের যেভাবেই থাক না কেন, প্রকাশ্যে তার মৈত্রী ও বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশে বাধ্য হতো। এদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সেই ব্যক্তি যাকে বুআসের যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ গোত্র থেকে নেতা নির্বাচনের সিদ্ধান্তে একমত হয়ে ছিল। অথচ এর পূর্বে এ দু'গোত্র মিলিতভাবে কোন লোককে নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে এক মত হতে পারে নি। নেতা নির্বাচনের পর তার জন্য মনিমুক্তা খচিত মুকুট তৈরি করা হচ্ছিল। এ মুকুট পরিয়ে দেয়ার পর তাকে মদীনার রাজা হিসেবে অভিষেক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমনের ফলে পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হয়ে উঠেন মদীনা সমাজের মধ্যমণি। এর ফলে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কারণেই মদীনার রাজ সিংহাসন থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। ফলে অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে নানাভাবে নানা চক্রান্তে করেও সে তেমন কোন সুবিধা করতে পারল না। বদরের যুদ্ধের পর যখন সে দেখল যে, অবস্থা মোটেই তার অনুকূল নয় এবং শিরকের উপর অটল থাকার কারণে তাকে পার্থিব ফায়দা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে, তখন সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বসল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কাফেরই ছিল।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শত্রুতার সামান্যতম সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করতে সে পিছপা হতো না। তার সঙ্গে সাধারণতঃ ঐ সকল নেতার সম্পর্ক ছিল যারা তার রাজত্বে বড় বড় পদ পাওয়ার আশায় আশান্বিত ছিল। কিন্তু মুসলিমগণের প্রাধান্যের ফলে এদেরকে তাদের আকাঙ্খিত পদ ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হল। এ জন্য তাদের আক্ষেপও কম ছিল না। এ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে তারা কোন কোন সময় সরল প্রাণ মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র হিসেবে চাইত।

(গ) তৃতীয় সম্প্রদায়ঃ মদীনার ইহুদীগণ হচ্ছে এ শ্রেণীভুক্ত। এরা এ্যাসিরীয় ও রোমীয়গণের অন্যায় অত্যাচার জর্জরিত হয়ে হিজাযে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরানী (হিব্রু) ভাষাভাষী। কিন্তু হিজাযে বসবাসের পর তাদের চাল-চলন, ভাষা এবং তাহযীব-তামুদ্দুন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরবী রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তাদের গোত্রীয় এবং ব্যক্তিমন্ডলও আরবী সংস্কৃতির প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইহুদী এবং আরবদের মধ্যে বিবাহ শাদির সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বংশধারা এবং বংশপরিচয় ঠিকই ছিল। আরবদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় নি। বরং নিজেদেরকে ইহুদী বা ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের অনুসারী বলে গর্ববোধ করত এবং আরবদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে মনে করত। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে অশিক্ষিত, বর্বর, হিংস্র, নীচ, অচ্ছুৎ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতেও ছাড়ত না। তাদের ধারণা ছিল যে, অরবদের সম্পদ তাদের জন্য বৈধ বা হালাল। আরবদের সম্পদ এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করার ফলে ইরশাদ হয়েছে,

(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ) [آل عمران: 75].

‘আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, যদি তাদের নিকট স্বর্ণের স্তূপ গচ্ছিত রাখ, তবে তোমাকে তা ফেরত দেবে, পক্ষান্তরে তাদের কেউ কেউ এমন যে, একটি দিনারও যদি তাদের নিকট গচ্ছিত রাখ, তার পেছনে লেগে না থাকলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না, এটা এজন্য যে, তারা বলে, ‘নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই’।’ (আল-‘ইমরান ৩ : ৭৫)

ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে ইহুদীদের মধ্যে কোন প্রকার সংগ্রামী চেতনা কিংবা উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ত না। ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত তা হল ভালো মন্দ লক্ষণ নির্ধারণ করা, যাদু ও টোনার ঝাঁড়ফুঁক এবং আরও নানা প্রকার তুকতাক করা। এসকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী গুণী এবং আধ্যাত্মিক ইমাম ও নেতা মনে করত।

অর্থোপার্জনের নানা পন্থা প্রক্রিয়া ও কৌশলাদির ব্যাপারে ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। বিখ্যাত শস্যাদি, খেজুর, মদ এবং বস্ত্র ব্যবসায়ে তারা ছিল সে জমানায় শীর্ষ স্থানীয় । তারা খাদ্যশস্য, বস্ত্র, মদ ইত্যাদি আমদানী করত এবং খেজুর রপ্তানী করত। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজেও তারা নিয়োজিত থাকত। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা আরবদের নিকট থেকে অত্যন্ত উচ্চ হারে মুনাফা আদায় করত। শুধু তাই নয়, তারা চড়া সুদে সুদী কারবারও করত। এ সকল সুদখোর ইহুদীরা আরবের বড় বড় ব্যবসায়ী নেতাদের সুদী ঋণ প্রদান করত। এ সকল ঘাতক ব্যবসায়ী ও নেতাগণ ঋণদাতা ইহুদীগণের প্রশংসা কীর্তনের জন্য এবং প্রশংসাসূচক কাব্য রচনার জন্য কবিদের অর্থ যোগান দিত। ঋণদানের সময় ইহুদীগণ ঋণ পরিশোধের পরবর্তী কালে চড়া সুদের ফলে সুদ আসলে ঋণলব্ধ অংকের অর্থ যখন অতিমাত্রায় ফুলে ফেঁপে উঠত তখন ঋণ গ্রহীতাদের পক্ষে সেই ঋণ পরিশোধ

করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। ফলে তাদের দায়বদ্ধ সম্পত্তি ইহুদীদের অধিকারে চলে যেত।

এরা কুচক্র, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। তারা এত সূক্ষ্ম ও কূটকৌশলের সঙ্গে প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করত যে, তারা এ ব্যাপারে কোন আঁচই পেতনা। তাদের কুচক্রিপণার ফলশ্রুতিতে গোত্রে গোত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকত। ঘটনাচক্রে যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা মন্দীভূত হলে তারা পুনরায় কুট-কৌশল প্রয়োগ করে তার তীব্রতা বাড়িয়ে দিত। এক্ষেত্রে সব চাইতে মজার ব্যাপার ছিল গোত্রে গোত্রে যখন ধ্বংসযজ্ঞ চলত তখন আরবদের এ ধ্বংসলীলা যাতে বন্ধ হয়ে না যায়, তদুদ্দেশ্যে যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়কে বিশাল বিশাল অংকের ঋণ স্বল্প সুদে প্রদান করত এবং বিনিময়ে তাদের সহায়-সম্পত্তি দায়বদ্ধ করে রাখত। এভাবে ক্বায়দা-কৌশল করে দোধারী অস্ত্রের মতো তারা দ্বিমুখী মুনাফা লুটত। অধিকন্তু এক দিকে তারা ইহুদী ঐক্য সংরক্ষিত করার ব্যাপারে যেমন সর্বক্ষণ স্বচেষ্ট থাকত অন্যদিকে তেমনি সুদের বাজার গরম রাখার জন্য সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকত।

ইয়াসরিবের ইহুদী গোত্রগুলোর তিনটি গোত্র ছিল সমাধিক প্রসিদ্ধ। এ গোত্রদ্বয় হচ্ছেঃ

১. বনু ক্বাইনুক্বা : এরা ছিল খাযরাজদের মিত্র এবং এদের আবাসস্থল মদীনার মধ্যেই ছিল।

২. বনু নাযীর : এরা ছিল খাযরাযের মিত্র এবং এদের আবাসস্থল মদীনার উপকণ্ঠে।

৩. বনু কুরাইযাহ : এ গোত্র দুটি ছিল আউসদের মিত্র। এদের বাসস্থান ছিল মদীনার উপকণ্ঠে।

প্রায় এক যুগ যাবৎ এ গোত্রদ্বয় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল এবং বুআসের যুদ্ধে আপন আপন মিত্র গোত্রের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এ টুকুই বলা যায় যে, তারা কখনই মুসলিমগণকে সুনজরে দেখত না। তারা সর্বদাই মুসলিমগণের ব্যাপারে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন থাকত। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে তাদের গোত্রীয় কিংবা বংশজাত কোন সম্পর্কই ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাদের বংশীয় টান তাদের আত্মা ও মন মেজাজের অংশ হিসেবে স্থান লাভ করত এবং এতে তারা প্রচুর আনন্দও পেত।

ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়ার অন্য একটি কারণ ছিল এর দাওয়াত ছিল একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের দাওয়াত যা ভাঙ্গা অন্তরকে জোড়া দিয়ে চলছিল, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অগ্নিকে নির্বাপিত করছিল, সকল লেনদের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন এবং হালাল উপার্জন ও হালাল ভক্ষণের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিল। এর ফলে ইয়াসরিবের গোত্রসমূহের মধ্যকার শিথিল সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে উঠতে থাকল যা হুদীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া ও আতঙ্কের সৃষ্টি করল। এ ব্যাপারে তাদের আশঙ্কা ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের রমরমাপূর্ণ সূদী কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া, সূদী কারবার সূত্রে কূট-কৌশলের মাধ্যমে মদীনাবাসীগণের যে সকল সম্পদ তারা কুক্ষিগত করে রেখেছিল সে সব কিছুই তাদেরকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হতে হবে।

যখন ইহুদীগণ বুঝতে পারল যে, ইসলামী দাওয়াত ইয়াসরিবের মাটিতে নিজের জন্য স্থান করে নিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন থেকেই তারা এটাকে তাদের জন্য একটি প্রকৃত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে নিল। একারণেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইয়াসরিবে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে তারা শত্রুতা

আরম্ভ করে দিল। অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের এ শত্রুতা গোপনে গোপনেই চলেছিল। তার পর প্রকাশ্যে শত্রুতা করার সৎসাহস তারা অর্জন করে। ইবনে ইসহাক্ব বর্ণিত একটি ঘটনা সূত্রে এ ব্যাপার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায় :

তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আমি উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা প্রাপ্ত হয়েছি যে, তিনি বলেন, 'আমি আমার আববা ও চাচাজান আবূ ইয়াসেরের নিকট তাদের সন্তানদের মধ্যে সব চাইতে অধিক প্রিয় ছিলাম। তাঁদের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে থেকে আমি যখনই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম তাঁরা সকলের চাইতে আমাকেই অধিক ভালবাসতেন এবং সকলের আগে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব ও আমার চাচা আবূ ইয়াসার অতি প্রত্যুষে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় টাল খেতে খেতে তারা ফিরছিলেন, আমি উঁকি মেরে তাদের দেখার পর পূর্বের নিয়ম মাফিক দৌড় দিয়ে তাঁদের নিকট গেলাম, কিন্তু আল্লাহর শপথ তাঁরা এত বেশী চিন্তিত ছিলেন যে, আমার প্রতি তারা ফিরেও তাকালেন না। আমি আমার চাচাকে বলতে শুনলাম, তিনি আববাকে বলছিলেন, 'ইনিই কি তিনি''? আববা বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ!' চাচা পুনরায় বললেন, 'আপনি তাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারছেন তো''?

পিতা বললেন, 'হ্যাঁ''।

তারপর চাচা বললেন, 'তার ব্যাপারে আপনি এখন মনে মনে কী ধারণা পোষণ করছেন?

পিতা বললেন, 'শত্রুতা, আল্লাহর শপথ! যতদিন জীবিত থাকব''।[1]

এর সাক্ষ্য সহীহুল বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, যাতে আব্দুল্লাহ বিন সালামের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন উঁচুদূরের আলেম ছিলেন। তিনি যখন অবগত হলেন যে, নাবী (ﷺ) বণী নাজ্জার গোত্রে আগমন করেছেন তখন তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, যার উত্তর একমাত্র নাবীগণ ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারেন না। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট থেকে প্রশ্ন সমূহের উত্তর পেয়ে গেলেন, তখন তিনি সেখানেই মুসলিম হয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেন যে, ইহুদীরা হচ্ছে মিথ্যা অপবাদকারী এক ঘৃণিত সম্প্রদায়। আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি জানার পর যদি তাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে তাঁরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিতে থাকবে।

এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এ আহবানে তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হল, এদিকে আব্দুল্লাহ বিন সালাম গৃহকোণে আত্মগোপন করে রইলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক তা জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে তারা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম এবং সব চাইতে বড় আলেমের পুত্র, তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সব চাইতে ভাল মানুষ এবং সব চাইতে ভাল মানুষের পুত্র।'

অন্য এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, তারা বলল, 'তিনি আমাদের সর্দার এবং সর্দারের ছেলে। আরও এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, তারা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আচ্ছা বলত আব্দুল্লাহ যদি মুসলিম হয়ে যায় তবে?'

ইহুদীগণ দু' কিংবা তিনবার বলল, 'আল্লাহ যেন তাঁকে এ থেকে রক্ষা করেন।' এ কথা শ্রবণান্তে আব্দুল্লাহ বিন সালাম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه" لاَ شَرِيْكَ لَه"، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

এ কথা শোনা মাত্রই ইহুদীগণ বলে বসল, (এ হচ্ছে আমাদের মধ্যে সব চাইতে খারাপ লোক এবং সব চাইতে খারাপ লোকের সন্তান)। এর পর তারা তার কুৎসা বর্ণনা করতে শুরু করে দিল। একটি বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) এ সময় বললেন, 'হে ইহুদীদের দল! আল্লাহকে ভয় কর। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তোমরা আরও জান যে, তিনি (মুহাম্মাদ (ﷺ)) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন।'

কিন্তু ইহুদীরা বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ''।[2]

এটা ছিল ইহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রথম অভিজ্ঞতা। আর তা মদীনায় প্রবেশের প্রথম দিনেই অর্জন হয়েছিল।

এ পর্যন্ত যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মদীনায় প্রবেশ কালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। মদীনার বাইরে মুসলিমগণের সব চাইতে শক্তিশালী শত্রু ছিল কুরাইশ মুশরিকগণ। মুসলিমগণকে দশ বছর যাবৎ তাদের প্রবল চাপ, ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং জুলুম নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান-আমান সংক্রান্ত সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সহিষ্ণুতা ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিমগণের আত্মিক উৎকর্ষতা চরমে পৌঁছেছিল। যার ফলে অনেক অসুবিধার মধ্যে থেকে তাঁদের মনোবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল।

মুসলিমগণ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, কুরাইশ মুশরিকগণ তখন তাঁদের বাড়িঘর এবং ধন-সম্পত্তি নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিল। শুধু সে সব নিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না, মুসলিমগণের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলল, অধিকন্তু, তারা যাকে পেল তাকেই বন্দী করে রাখল এবং তাদের উপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকল। কিন্তু এত করেও তারা ক্ষান্ত হল না, আরও চরম ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা এবং তাঁর দাওয়াতকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকল। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ যখন কোনভাবে জীবন রক্ষা করে পাঁচশ' কিলোমিটার দূরত্বে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন কুরাইশগণ সুযোগের সদব্যবহার করে এক রাজনৈতিক কূটকৌশলের প্রয়োগ শুরু করল। যেহেতু তারা ছিল বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতিবেশী, সে কারণে আরব বাসীদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, পার্থিব ঐশ্বর্য ও পদসমূহ তাদের অধিনস্থ ছিল। এ কারণে তারা আরব উপদ্বীপের মুশরিক অধিবাসীদেরকে মদীনার বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করে ফেলল। যার ফলে মদীনায় জিনিসপত্র আমদানী ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকল। অথচ মুহাজিরদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতেই থাকল। প্রকৃতপক্ষে মক্কার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মদীনার মুসলিমগণের নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। যারা সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এ যুদ্ধের দোষ এবং দায়-দায়িত্ব মুসলিমগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তাদের সম্পর্কে বুঝতে হবে যে, হয় তারা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে একথা বলছে, নতুবা এ ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই।

মুসলিমগণের জন্য এ পর্যায়ে নায্য প্রাপ্য এটাই ছিল যে, যেভাবে তাদের সম্পদ হরণ করা হয়েছে তেমনিভাবে তাঁরাও দুস্কৃতিকারীদের সম্পদ হরণ করবেন, যেভাবে তাঁদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন চালানো হয়েছে সেভাবে তাঁরাও অত্যাচারীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, যেভাবে মুসলিমগণের জীবনধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনিভাবে তাঁরাও তাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। মোট কথা, দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নীতি অবলম্বন করে চলবেন যাতে মুসলিমগণের প্রতি তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের ধারণা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ ও সমস্যাসমূহ যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নাবী, রাসূল, হাদী ও নেতা হিসেবে মদীনা আগমনের পর প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সে সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন নাবী এবং নেতা সুলভ ভূমিকার মাধ্যমে। যে সম্প্রদায় দয়া পাবার যোগ্য তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং যারা কঠোরতা পাবার যোগ্য তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি এ সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কঠোরতার চাইতে দয়াই তাঁর অধিক কাম্য এবং প্রিয় ছিল। যার ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামের চাবিকাঠি মুসলিমগণের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এ সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হবে।

ফুটনোট

[1] ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৫১৮-৫১৯ পৃঃ।

[2] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৪৫৯, ৫৫৬ ও ৫৬১ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6164

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন